

কোর্স রিজুভিনেশনে
অংশ নিন

জেগে উঠুন
নতুন উদ্দীপনায়

প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্যের সরলপথ কোয়ান্টাম মেথড। একজন মানুষকে যা সাহায্য করে জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে, উদ্বুদ্ধ করে ভেতরের ইতিবাচকতা বিকাশে, অনুপ্রাণিত করে আত্মশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণে।

ফলে যাপিত জীবনের অস্থিরতা নিয়ে যিনি এ কোর্সে আসেন, তিনি খুঁজে পান প্রশান্তি; রোগ-জর্জরিত মানুষ লাভ করেন সুস্বাস্থ্যের কার্যকর দিক-নির্দেশনা আর ব্যর্থতার হতাশা রূপ নেয় সাফল্যের উদযাপনে।

তাই জীবনের এ পরিবর্তনকে স্থায়ী রূপ দিতে নিয়মিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্স রিজুভিনেশনে অংশ নিন। আপনি জেগে উঠবেন প্রশান্তি, সুস্থতা, সাফল্য ও কল্যাণের নতুন উদ্দীপনায়। ইতিবাচকতা ও আত্মশক্তি বিকাশে যা হবে এক অনন্য উদ্যোগ।

বছরে অন্তত দু-তিন বার সপরিবারে কোর্স রিজুভিনেশনে অংশ নিতে সচেষ্ট হোন, এটি আপনার পরিবারকে করে তুলবে পারস্পরিক সমর্মিতা ও অনুপ্রেরণার অফুরান উৎস। সেইসাথে বন্ধু, স্বজন, প্রতিবেশী ও পরিচিত গ্রোজুয়েটদেরও বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করণ কোর্স রিজুভিনেশনে।

কল্যাণসম্পর্শে সার্থক ও আলোকিত হয়ে উঠুক আপনার এবং আপনার চারপাশের সবার জীবন।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪২৭ ব্যাচ II ঢাকা

৭, ৮, ৯ ও ১০ এপ্রিল

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

**স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা**

৪২৬ ব্যাচ II বরিশাল

৩১ মার্চ, ১, ২ ও ৩ এপ্রিল

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : বরিশাল ক্লাব, বরিশাল

৪২৮ ব্যাচ II বগুড়া

২১, ২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : হোটেল নাজ গার্ডেন, বগুড়া

৪২৯ ব্যাচ II উত্তরা

৫, ৬, ৭ ও ৮ মে

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, উত্তরা



কোয়ান্টাম বুলেটিন

মার্চ ২০১৭

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিরাপদ ও স্বেচ্ছা রক্তদানের পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠান কোয়ান্টাম



আজকের অনুষ্ঠানের জন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন থেকে যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো—আমি বলেছি, আমি অবশ্যই যাব। কারণ, নিরাপদ ও স্বেচ্ছা রক্তদানে আপনারা একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিরাপদ রক্ত না হলে কোয়ান্টাম কারো রক্ত নেয় না। এবং এটাই হওয়া উচিত।

১৭ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত ১৫ তম গোল্ডেন ডোনার সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভিসি ও বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লাহ।

উল্লেখ্য, ২৫ বারের বেশি রক্তদান করেছেন এমন দেড় শতাধিক গোল্ডেন ডোনারকে অনুষ্ঠানে বিশেষ ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও আইডি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এখন অনেকেই আছে যারা পেশাদার ও মাদকাসক্ত রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত নিচ্ছে এবং মানুষকে আরো ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমি কোয়ান্টামকে ধন্যবাদ দেই, স্বেচ্ছা দানের ভিত্তিতে নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ করে আপনারা মানুষকে সুস্থ করে তুলছেন।

তিনি আরো বলেন, আমার এক সহকর্মী রাজনীতিক আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনি কোয়ান্টামে আসুন। আপনার ভালো লাগবে। সত্যিই আমার আজ ভালো লাগছে এ অনুষ্ঠানে এসে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লাহ বলেন, আপনারা যারা ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন তারা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর রক্ত দিলে শরীর ভালো থাকে—এটা যদি সবাই বুঝতে পারে তবে রক্তের কোনো সংকট দেশে হবে না। তাই কোয়ান্টাম এ অনন্য সেবা কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখবে, এটাই আমার প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন কোয়ান্টাম ল্যাবের অনারারি কনসালটেন্ট ও বিএসএমএমইউ-র হোমোটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস।

মুক্ত আলোচনায়
ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক
জাতীয় পুনর্জাগরণে
চাই সর্বস্তরে
মাতৃভাষার চর্চা



পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা গেছে—একথা শুনে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে হাজির হন কয়েকশ মানুষ। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যারা ভাষা আন্দোলন সমর্থন করেন নি। তবু তারা সেদিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন ছাত্রদের প্রতি মমতা ও সমর্মিতাবোধ থেকে।

মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে ছাত্রদের আত্মত্যাগের খবর কেবল ঢাকা শহর নয়, খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এদেশের জেলা মহকুমা এমনকি গ্রামেও। সারাদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, সর্বস্তরে বাংলা চাই ইত্যাদি স্লোগান। আর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ঘটে বাঁকবদলকারী পরিবর্তন।

ইউরোপে মধ্যযুগ ছিল ল্যাটিন ভাষার স্বর্ণযুগ। সেসময় বিভিন্ন জাতি তাদের মাতৃভাষাকেই জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। মাতৃভাষা চর্চার পথ ধরেই ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। সূচিত হয় রেনেসাঁ, জ্ঞানচর্চা, শিল্পবিপ্লব ও পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ স্থাপনের।

আসলে দেশের স্বার্থে ও মানুষের স্বার্থে উচ্চশিক্ষা, উচ্চ আদালতসহ সর্বস্তরে বাংলা চালু করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চীনা ও জাপানী ভাষার মতো প্রাগৈতিহাসিক জটিল ভাষায় যদি ব্যবসাবাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ চলতে পারে, তাহলে বাংলার মতো উন্নত ভাষাতেও তা অবশ্যই করা যাবে।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বরেন্দ্র ভাষাসংগ্রামী ও রবীন্দ্র গবেষক আহমদ রফিক। কাকরাইলের কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন ভাষাসংগ্রামী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম স্থপতি ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী।

QUANTUM the SCIENCE of LIVING

নাসিরউদ্দীন ইউসুফ। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও এদেশের নাট্যজগতের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। গত ১ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামের সভাপতিত্বে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনার ৬০তম পর্বে তার বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

একাত্তরের সমমর্মিতা ফিরিয়ে আনতে হবে

নাসিরউদ্দীন ইউসুফ

১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ কেরানীগঞ্জে আমরা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি। ২ এপ্রিল ভোরে ঘুম ভাঙল গুলির আওয়াজে। পাক আর্মি আমাদের ক্যাম্পটির কথা জেনে গেছে। মাদ্রাসার মাঠে পজিশন নিয়েছে ওরা। খালের ওপারে শালবনের ফাঁক দিয়ে দেখলাম চারদিক থেকে গুলি করছে পাকিস্তানিরা। মানুষ প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। এলএমজি ফায়ার করার সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়ল। যারা তখনো মারা যায় নি, তাদের গায়ে পাকিস্তানিরা আগুন লাগিয়ে দিল।

কবি নির্মলেন্দু গুণের একটি বইতে এই ঘটনার অনবদ্য বর্ণনা আছে। আমি সেদিন এমনও দেখেছি, একজন মানুষ দৌড়াচ্ছে। তার কানে গুলি লেগে মাথাটা ছুটে গেল। লোকটা দু-তিন পা এগিয়ে চলে পড়ল। এমনই ছিল একাত্তরের গণহত্যা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ আবহমানকাল থেকে এ জাতিটির দেশ ছিল, রাষ্ট্র ছিল না। চর্যাপদ থেকে শুরু করে ১৯৭১ পর্যন্ত ধারাবাহিক একটি ভাষারীতি আমরা দেখতে পাব-বাংলা। কিন্তু প্রায় চার হাজার বছরের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যাবে, বাঙালি একাত্তর সালের আগে কখনো স্বাধীন ছিল না। অনেকে বলেন পাল ও সেন আমলে জাতি স্বাধীন ছিল। কিন্তু সে শাসকরা বাঙালি ছিল না। রাজনৈতিকভাবে বাঙালি সচেতন হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিটি ১৯০৬ সালে আমরা প্রথম শুনতে পাই। এটি এসেছিল স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। তারপরের ইতিহাস করুণ-রক্তাক্ত ও বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ।

স্বাধীনতার নামে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হলো। সাম্প্রতিক বিশ্ব-ইতিহাসে এরকম ট্রাজিক ঘটনা দ্বিতীয়টি নেই। রাতের অন্ধকারে বসে বাঙালি জাতিকে ভাগ করা হলো ধর্মের ভিত্তিতে। ‘৭১ সালে আগরতলা যাওয়ার সময় আমি দেখেছি একটি বাড়ির শোয়ার ঘর পড়েছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আর রান্নাঘরটা ভারতে। মায়ের ঘর পূর্ব বাংলায়, ছেলের ঘর ত্রিপুরায়। এটা কী ধরনের ভাগ! এর চেয়েও বড় ট্র্যাগেডি হলো দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু।

পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির ভাষা ছিল উর্দু। ১৯৪৭-এর আগে শাসকদের ভাষা ছিল ইংরেজি। তারও আগে ফারসি। সংগত কারণেই ১১ মার্চ ১৯৪৮ জিন্মাহ ঢাকায় এসে বললেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাঙালি বলল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। অর্থাৎ যে সাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল দেশভাগের সাত মাসের মাথায় বাঙালি তা প্রত্যাখ্যান করল। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষা এবং সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হলো, যা বাঙালির জীবনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আমি মনে করি, মুক্তিযুদ্ধের চেয়েও বড়। কারণ ভাষাটা যদি সেদিন না বাঁচত, বাংলাদেশ হতো না।

কিন্তু বাঙালির রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি ভাষা নিয়েও টালবাহানা শুরু হলো। আইয়ুব খান রবীন্দ্রসংগীত বন্ধ করল। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনেও নিষেধাজ্ঞা জারি করল। এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রবল সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রমাণ করল বাঙালি স্বতন্ত্র জাতি। তার ইতিহাস হাজার বছরের। এই ভূখণ্ড আমাদের। আমরা নিজস্ব রাষ্ট্র চাই।

অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন জাতীয় রাজনৈতিক



আন্দোলনে রূপ নিল। সত্তরের নির্বাচনের পর ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিটি আস্তে আস্তে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বাঙালির হাতে ক্ষমতা দেয়া হলো না। ঘনিয়ে এলো ২৫শে মার্চ।

সে-রাত্রে ঢাকার শান্তিনগরে এক বাড়ির ছাদের ওপর থেকে দেখলাম পাকিস্তান আর্মির তাণ্ডব। মনে হচ্ছিল পুরো ঢাকা শহর জ্বলছে। গান পাউডার ও কামানের গোলায় চলল ব্যাপক ধ্বংসলীলা। আসলে ২৫ মার্চের আগে আমরা ভেবেছিলাম স্লোগান দিয়ে মিছিল করে কিছু একটা করে ফেলব।

কিন্তু পাকিস্তানের মতো নিপীড়ক রাষ্ট্রের হিংস্র সেনাবাহিনীর কাছে দয়া-মায়ী প্রত্যাশা করা ভুল।

২৬ তারিখ ভোরে দেখেছি লাশ টেনে টেনে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। রাজারবাগে কাঁটাতারের ওপর নিহত পুলিশ ভাইদের লাশ বুলছিল। শরীর থেকে হাত-পা আলাদা। আগের রাত্রে অবশ্য কিছু পুলিশ পালিয়ে আমাদের এলাকায় আসতে পেরেছিল। তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম সাতটা রাইফেল ও গুলি। শহরে তখন কারফিউ। বিদ্যুৎ-পানি নেই, টেলিফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন।

২৭ তারিখ চার ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তুলে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল! জগন্নাথ হল থেকে নীলক্ষেত-পুরো এলাকায় লাশ আর লাশ! তাড়াতাড়ি ফিরে এসে অস্ত্রগুলো বের করে সোজা সদরঘাট। কোথায় যাচ্ছি জানি না। জিজ্ঞারায় পৌঁছে দেখি লক্ষ লক্ষ মানুষ ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। আসলে একাত্তরের

মতো মানুষ হয় না। নিজে না খেয়ে অচেনা অসহায় মানুষকে খাইয়েছে। শরণার্থীর একমাত্র পরিচয়-সে বাঙালি, সে মানুষ।

শহরে গ্রামে কোথাও খাবারের জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জোর করতে হয় নি। আমি সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জের দিকে দেখেছি মাঝিরা মাছ ধরে ফেলার সময় যার যার ভাগ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে অল্প করে মাছ রেখে যেত। গ্রামের কৃষকরা সবজি দিয়ে যেত। সেদিন মানুষ একে অপরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

একটা ঘটনা বলি। কেরানীগঞ্জে এক কৃষকের বেড়ার ঘরে আমরা অস্ত্র রাখতাম। তার বাড়িতে থেকেছিও। একদিন ওখানে গিয়েছি গ্রেনেড নিতে। আমি গ্রেনেডের পিন খুলে বাড়ির বাচ্চা ছেলেটাকে দিচ্ছি শুকাতে দেয়ার জন্যে। সে শুকাতে দিয়ে আবার ঘরে এসে ঢুকছে। ওর সাথে কথা বলতে বলতে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ পিনটা খুলে লিভারটা ছেড়ে দিয়েছি।

ভুল টের পাওয়ার সাথে সাথে গ্রেনেডটা দু হাতের তালুতে চেপে ধরলাম। ছেলেটা লাফিয়ে বাইরে চলে গেল। আমি গুনছি-এক দুই তিন চার। মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে ঘামছি। কিন্তু ফাটল না। পরে গ্রেনেড খুলে দেখেছি ভেতরে একটা পানির বিন্দু থাকায় জানে বেঁচে গেছি। দুপুরবেলা খেতে বসে দেখি মাটির খালায় দুধ আর ভাত। আমি তো অবাক। কৃষকের স্ত্রী বললেন, আপনি বেঁচে গেছেন বলে মসজিদে শিনি দিয়েছি! অথচ আমি তাদের কেউ না। ৪৫ বছরে একবার দেখা হয়েছে। আর হয়তো হবেও না। একাত্তরের সম্পর্কটা এমনই। যা কোনোকিছু দিয়েই পরিমাপ করা যাবে না।

তাই সেদিন যে আদর্শ চেতনা ও মানুষে মানুষে মমতা ভালবাসা ছিল তা হৃদয়ে অনুভব করতে হবে। কারণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পৃথিবীতে এসেছে অস্ত্র ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। একাত্তরের আদর্শ ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

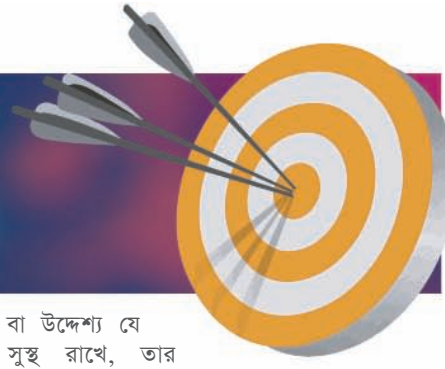
নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আমি তাই আশাবাদী। থিয়েটারের কাজে কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম যমুনার চরে। পুরোটা পথ হেঁটে যেতে হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা এসেছে শুনে সেখানকার ছোট ছোট শিশুরা পতাকা নিয়ে হাজির। তারা মুক্তিযুদ্ধের কতটুকুই-বা বোঝে! কিন্তু এই সরলতা ও মমতা এখনো আছে বলেই বাঙালি আবার ঘুরে দাঁড়াবে। তরুণ প্রজন্ম সেই কাজটি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

[অনুলিখিত]



নিউ সায়েন্টিস্ট সাময়িকীর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য জীবনকে সুখী করে ॥ সুস্থ রাখে শরীর মন



“জীবনে যার বেঁচে থাকার একটা ‘কারণ’ আছে, জীবনটা তার জন্যে অনেক সহজ।” উনিশ শতকের জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিটশের কথা এটি। এর পর দু-শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, কিন্তু হালের মনোবিদ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের বহু গবেষণালব্ধ ভাষা আজও ঠিক সেটাই, তা হলো, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মানুষকে সুখী ও দীর্ঘায়ু করে। শরীর-মনকে রাখে সুস্থ ও প্রাণবন্ত। বাড়িয়ে দেয় তার কর্মক্ষমতা। চলুন খুঁজে দেখা যাক কী তার রহস্য!

লক্ষ্যই জীবনের মূল চালিকাশক্তি

জীবনের এক ধ্রুব সত্য এটি। বড় কোনো সাফল্য বা জীবনের মহান গল্পগুলোও পরিপূর্ণতা পায় লক্ষ্যকে অনুসরণ করেই। লক্ষ্য জীবনকে অর্থবহ করে। বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। সুদীর্ঘ গবেষণার ফলাফলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, যারা বেঁচে থাকেন একটা লক্ষ্যকে ঘিরে—তারা লাভ করেন দীর্ঘজীবন, ঘুম ভালো হয় তাদের। স্ট্রোক ও বিষণ্ণতার ঝুঁকি থেকে তারা মুক্ত থাকেন। অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় সূচকেও তাদের অবস্থান অন্যদের চেয়ে ভালো।

গবেষকদের মতে, লক্ষ্যভিসারী মানুষেরা যে-কোনো আসক্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন দ্রুত। আছে আরো আরো বিস্ময়কর তথ্য—রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে তারা অগ্রণী। চিকিৎসকরা বলছেন, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো যদি এ দাওয়াইটা কোনোভাবে বোতলজাত করতে পারত তবে ওদের বিলিওনিয়ার হওয়া আর ঠেকাত কে!

লক্ষ্য কীভাবে জীবনের গতিধারাকে প্রভাবিত করে, দেহ-মনে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে—এ নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেন অস্ট্রিয়ান মনোবিদ ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইহুদি নিধনযজ্ঞ থেকে বেঁচে ফেরা একজন স্নায়ু-চিকিৎসক ছিলেন তিনি।

নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দী দিনগুলোতে ভিক্টর অন্যান্য সহবন্দীদের পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি দেখেছেন যে, টানা দুর্ভোগে যারা বোধশক্তি হারিয়ে বসেছিল, সামনে কোনো আশা দেখতে পাচ্ছিল না, খুঁজে পাচ্ছিল না বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য, তারা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে পড়ছিল এবং একসময় জীবন থেকে পুরোপুরিই হারিয়ে গিয়েছিল ওরা।

পরবর্তীতে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল এসব নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন এবং বিশ্বযুদ্ধের পর নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এ গবেষণায়—জীবনে লক্ষ্যের প্রভাব।

লক্ষ্য মানুষকে বদলে দেয় কমায় রোগঝুঁকি, রাখে সুস্থ

গবেষকরা এখন লক্ষ্যকে সংজ্ঞায়িত করছেন জীবন বদলের অনুঘটক হিসেবে। তারা বলছেন, লক্ষ্য হতাশা দূর করে। জীবনে সন্তুষ্টি যোগায়। একজন মানুষকে বদলে দেয় ভেতর থেকে। তার দৈনন্দিন আচরণ-অভ্যাসে সূচিত হয় দৃশ্যমান পরিবর্তন। সবমিলিয়ে বলা যায়, জীবনে সুখী হওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্যের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

বয়স, পেশা, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে

স্বাস্থ্যের ওপর লক্ষ্যের ইতিবাচক প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। ১০ বছরের ধারাবাহিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, লক্ষ্য-সচেতন মানুষেরা নিয়মিত ব্যায়াম এবং সুস্থ খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সঠিক জীবনচারণা অনুসরণে এবং মাদকাসক্তির মতো বদভ্যাস বর্জনে তুলনামূলক আন্তরিক। এর পাশাপাশি ঘুম-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে এবং জীবনের অন্যান্য স্বাভাবিক আনন্দ উদযাপনে এরা অধিকতর সক্ষম।

১৬ হাজার মধ্যবয়সী মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিকের ওপর পরিচালিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এদের মধ্যে যারা নিজ লক্ষ্যের ব্যাপারে যত সচেতন ছিলেন—রোগ ও অন্যান্য কারণে তাদের মৃত্যুহার তত কমেছে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমেছে ২৭ শতাংশ, স্ট্রোকের ২২ শতাংশ, বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম আলঝেইমার্সের ঝুঁকি নেমে এসেছে অর্ধেক।

লক্ষ্য আক্ষরিক অর্থেই ধন্যস্তরী। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত এটি। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক প্যাট্রিক হিলের মতে, লক্ষ্য-সচেতন মানুষের আয় ও প্রাচুর্যের সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি।

লক্ষ্য-সচেতনতা জীবনকে অর্থবহ করে নার্সাস সিস্টেমকে করে সহজত

লক্ষ্য মানুষকে কর্মোদ্যমী করে। তাকে উজ্জীবিত করে কর্তব্যবোধে। জীবনকে করে তোলে অর্থবহ। এ নিয়ে আশ্চর্য তথ্য দিচ্ছেন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শিগেহিরো ওশি। ১৩২টি দেশের এক লক্ষ ৪১ হাজার নাগরিকের ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে তিনি বলছেন, ধনী দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকেরা এদিক থেকে এগিয়ে আছেন। ধনী দেশগুলোতে বছরকম সম্ভাব্য সুযোগের সামনে একজন মানুষ অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাশ্রিত হন, তুলনায় দরিদ্র দেশের মানুষের কাছে সেটি অধিকতর স্পষ্ট। ফলে এরা সহজেই জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পান।

আর লক্ষ্যহীন জীবনে বাঁচার কোনো অর্থ খুঁজে না পেয়ে হা-হুতাশে যারা অস্থির, তাদের জন্যে দুঃসংবাদ। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্টিভেন কোল বলেন, একাকিত্ব ও এর ফলে সৃষ্ট স্ট্রেস মানবদেহের জিনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা দেহে রোগ-প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি কাজকে ব্যাহত করে, বাড়ায় হৃদরোগ, আলঝেইমার্স ও ক্যান্সারের ঝুঁকি।

লক্ষ্য-সচেতনতা দেহের নার্সাস সিস্টেমকে সংহত করে। ফলে উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতি ও বিপদে দেহে এড্রিনালিন নিঃসরণের পরিমাণ কমে এবং হার্ট রেট ও শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে নিয়ন্ত্রণে। এতে স্ট্রেসজনিত রোগের ঝুঁকি কমে।

মস্তিষ্ক ও জিনের সুস্থতার জন্যে চাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মেডিটেশন চর্চা

মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ভেন্ট্রাল স্ট্রিয়াটাম। বিজ্ঞানীরা বলছেন, লক্ষ্য-সচেতন মানুষের ক্ষেত্রে এটি থাকে অধিকতর সক্রিয়, যা দেহ-মনে নির্মল অনুভূতি সৃষ্টি করে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুখপ্রদ চিন্তাবানোও মস্তিষ্কের এ অংশের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। কমায় স্ট্রেস হরমোন কর্টিসোলের প্রভাব।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যে মানুষকে সুস্থ রাখে, তার আরেকটি প্রমাণ মিলেছে জিনবিজ্ঞানীদের গবেষণায়। প্রতিটি দেহকোষে থাকে ক্রোমোজম, এর প্রান্তভাগে রয়েছে টুপিসদৃশ ‘টেলোমেরার’, যা ডিএনএ-কে সুরক্ষা দেয়। আর এই টেলোমেরারের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে আমাদের দীর্ঘায়ু। কিন্তু বয়স ও স্ট্রেসের ফলে টেলোমেরারের দৈর্ঘ্য কমেতে থাকে অর্থাৎ কমে দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা। তবে গবেষকদের মতে, লক্ষ্য-সচেতনতা ও মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে এর গতিরোধ সম্ভব। সমস্মী হৃদয়ে অন্যের কল্যাণচিন্তাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর বলে জানান তারা।

এসব বিবেচনায় গবেষকদের পরামর্শ হচ্ছে, জিডিপি ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মতো ‘জীবনে লক্ষ্য-অনুসারী হওয়ার’ শিক্ষাটিও পাবলিক পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক মাইকেল স্টেগার বলেন, ‘এটা করা হলে দেশে চিকিৎসাব্যয় ও অকালমৃত্যুর হার কমেবে, সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন ঘটবে।’

লক্ষ্য-সচেতন হোন ॥

প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্য আপনার

আপনিও লক্ষ্য-সচেতন হোন। আপনার ব্যক্তিগত জীবন পরিবার পেশা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ—সবগুলো দিকই গতিময় হয়ে উঠবে সে লক্ষ্যকে ঘিরে। প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্যের পথে বহুধাপ এগিয়ে থাকবেন আপনি। এ ব্যাপারে স্টেগার-এর পরামর্শ হলো, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, তারপর তা অনুসরণ করে ছোট ছোট পদক্ষেপে ক্রমাগত এগিয়ে যান।

লক্ষ্য নিরূপণের চিরায়ত এক উপায় বাতলে দিয়েছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-গবেষক ও লাইফ অন পারপাস গ্রন্থের লেখক ভিক্টর স্ট্রেচার। তার পরামর্শ—‘ভাবুন পৃথিবীতে আপনার শেষ দিনটির কথা, শব্দাত্মক লোকের মুখে কী শুনতে চান নিজের সম্পর্কে? কিংবা ওদের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি বেঁচে থাকতে চান এক অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে? এ থেকেই বুঝে নিতে পারেন কী হওয়া চাই আপনার লক্ষ্য।’ (দু-যুগ ধরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অনুষ্ঠিত জীবনছবি মেডিটেশনের হুবহু চিত্রকল্প যেন!)

মনোবিদরা বলছেন, এ অনন্য কল্পনা মানুষকে মুক্তি দেয় জীবনের অর্থহীনতা ও বিষণ্ণতার আক্রমণ থেকে। আর পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের সামনে স্থাপন করে অসামান্য এক দৃষ্টান্ত।

প্যাট্রিক হিলের মতে, ‘বয়স আপনার যা-ই হোক, ২০ কিংবা ৭০, জীবনের লক্ষ্যটা একবার মনে গাঁথা হয়ে গেলে এর প্রভাব আপনার শরীর মনে স্পষ্টতই অনুরণিত হবে। আর এ কল্পনা হয়ে উঠবে আপনার চিরপ্রেরণার উৎস। তাই, এমনকি অবসর গ্রহণের পরও থাকুন লক্ষ্যগামী ও কর্মব্যস্ত—মানুষের কল্যাণে, সমাজের উন্নয়নে।’

ডা. আতাউর রহমান

নিউ সায়েন্টিস্টে (২৮ জানুয়ারি ২০১৭) প্রকাশিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদন The meaning of Life অবলম্বনে

সমমর্মী হতে শেখায় মেডিটেশন

ডা. মোহাম্মদ আকতার উল ইসলাম



আমি এই কোর্সে এসেছিলাম শুধু মেডিটেশন শিখতে। কিন্তু এ চার দিনে মেডিটেশন ছাড়া আরো অনেক কিছু শিখেছি। গুরুজী মানুষের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা

করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমি বলব, এ কোর্স হচ্ছে একটা কমপ্লিট লাইফ প্যাকেজ। মা-বাবার উৎসাহে আমি সক্রিয় এ কোর্সে অংশ নিয়েছি এবং খুবই উপভোগ করেছি।

আমি বিশ্বাস করি, মেডিটেশন আমাদের জীবনকে সুশৃঙ্খল করবে, সুন্দর করবে। এখানে এসে সবচেয়ে বেশি পেয়েছি সমমর্মিতার শিক্ষা। মেডিটেশন আমাদের শেখায়-যদি আমার পাশের মানুষটিকে সহযোগিতা করতে না পারি, তাহলে আমার সব শিক্ষাই অর্থহীন। আমি মনে করি, আমরা সকল চিকিৎসক যদি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি, তাহলে শুধু ভালো চিকিৎসকই নয়, বরং ভালো মানুষও হতে পারব।

[টিউটর, ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল গ্রাজুয়েট টিচিং সেন্টার, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া। ৪১৮ ব্যাচ, ঢাকা]

আমার শরীরে এখন কোনো ব্যথা নেই

মোসাম্মত শাহিদা বেগম

দীর্ঘদিন ধরে আমি পায়ের ব্যথায় ভুগছিলাম। হাঁটতে পারতাম না। ডানদিক অবশ্য হয়ে যেত। ঠিকমতো বসতেও পারতাম না। ডাক্তার বললেন, মেরুদণ্ডের হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে। অনেক ওষুধ দিলেন।



আমার ছেলেকে বললেন, তোমার মায়ের কোমরে বেল্ট বেঁধে তিনটা ইট দিয়ে টানা দিয়ে রাখো। কিন্তু ব্যথা কমল না। এরপর আরেকজন ডাক্তারকে দেখালাম। একসাথে পাঁচটা ইঞ্জেকশন দিলেন। এতেও আমার ব্যথা কমে নি।

প্রচণ্ড ব্যথা নিয়েই আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসেছিলাম। প্রথমদিন চার-পাঁচজন মিলে আমাকে ধরে তিন তলায় ক্লাসরুমে উঠিয়েছে। কিন্তু গুরুজীর কথা শুনে এবং মেডিটেশন করে মনে একটা শক্তি পেলাম। দ্বিতীয় দিন আল্লাহর রহমতে কারো সাহায্য ছাড়াই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। আমার শরীরে এখন কোনো ব্যথা নেই। আগে বসে নামাজ পড়তে হতো কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ।

[গৃহিণী। ৪১৮ ব্যাচ, ঢাকা]

১০ বছর পর রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়লাম

জাকিয়া বেগম

একটা দুর্ঘটনায় আমার কোমরে লাঙ্গার ডিস্কে সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং তারপর ব্যথা বাড়তে বাড়তে হাঁটতে যাড়ে মেরুদণ্ডে সমস্যা দেখা দিল। ঠিকমতো হাঁটতেও পারতাম না। সেইসাথে এজমার সমস্যা।



অনেক চিকিৎসা করিয়েও ব্যথা দূর হয় নি। ডাক্তার বলেন, এই ব্যথা আমাকে কবর পর্যন্ত বহন করতে হবে। আর এজমাও কখনো ভালো হবে না। আমার সব আত্মবিশ্বাস যেন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমার স্বামীর উৎসাহেই আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি। এখানে আসার আগের দিন পর্যন্ত মনে করতাম, আমি কিছুই করতে পারব না। আমি একটা রোগী। কিন্তু কোর্সে এসে আমার মনের জোর অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমার কোনো ব্যথা নেই। গত ১০ বছর ধরে আমি বসে নামাজ পড়তাম। এখন আমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছি। ঘুমের ওষুধ ছাড়া আমি ঘুমাতে পারতাম না। এখন ওষুধ ছাড়াই ঘুমাচ্ছি।

আমার আরেকটা বড় উপলব্ধি হলো, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। দৈহিক গড়ন, উচ্চতা-এসব কোনোকিছু নিয়েই হীনম্মন্যতায় ভোগার প্রয়োজন নেই। মনে হচ্ছে কোর্সে এসে নতুন করে জন্ম নিলাম।

[চাকরিজীবী। ৪১৮ ব্যাচ, ঢাকা]

শিথিলায়ন বদলে দিয়েছে আমার জীবন

ডা. রণজিৎ সরকার

বছর চারেক আগে আমি তীব্র হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু হতাশা থেকে মুক্ত হতে পারি নি।



সে-সময় চেম্বরে রোগী দেখতে গিয়েও মনোযোগ হারিয়ে

ফেলতাম। তখন শিথিলায়ন মেডিটেশন চর্চা শুরু করি। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার ফলে পুরোপুরি বদলে গেল আমার জীবন। হতাশা দূর তো হয়েছিল, এসেছে পেশাগত সাফল্যও। রোগীদেরও ওষুধের পাশাপাশি শিথিলায়ন চর্চার পরামর্শ প্রদান করি। আমি দেখছি তারা এতে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। আমার পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে। আমি মনে করি, আমার সকল সাফল্যের মূলে রয়েছে শিথিলায়ন মেডিটেশন।

[হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। ৪১৯ ব্যাচ, ঢাকা]

নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি

নায়লা নাসরিন রিজি

আমার ভেতরে একটা অস্থিরতা কাজ করত মাঝে মাঝে। কারণ বিল্ডিং-এর ডিজাইন নিয়ে যখন চিন্তা করতাম, আশেপাশের কোনোকিছু আমার ভালো লাগত না। এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করত। আমার মা তখন আমাকে মেডিটেশন করতে উৎসাহ দিতেন।



তখন আমি ভাবতাম, বসে বসে এতক্ষণ ভাবছি, কোনো কাজ হচ্ছে না। মেডিটেশন করলে কি কাজ হবে? এখানে এসে বুঝলাম মেডিটেশনের মাধ্যমেই আসলে কাজটা আরো সুন্দর হবে। কারণ কীভাবে মনকে স্থির করতে হবে, এটা শেখায় মেডিটেশন। আর সাফল্যের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনের স্থিরতা ও মনোযোগ।

আর্কিটেকচারে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে নিজেকে যতটা না সৌভাগ্যবান মনে করেছি, তার চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান মনে করছি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। কোর্সের শিক্ষাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি একজন সফল মানুষ হতে চাই।

[স্থপতি। ৪২১ ব্যাচ, রাজশাহী]

সময়-সচেতন হতে পেরেছি ইহফাজ মাহমুদ আলী

খুব ছোটবেলায় আমার মনে ভূতের ভয় ঢুকছিল এবং নয় বছর বয়স পর্যন্ত আমি খুব ভয় পেতাম। পরবর্তীতে আমার মধ্যে এ ভয় আবার ফিরে আসে রেডিও-তে একটা ভূতের প্রোগ্রাম শুনে। রাতে বাথরুমে যেতে পারতাম না এই ভয়ের কারণে।



কিন্তু কোর্সের প্রথমদিনই গুরুজী বললেন, পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে। তাই ভয় দূর করার জন্যে অটোসাজেশন চর্চা করতে হবে। আমি অটোসাজেশন চর্চা করলাম এবং এখন আমার মধ্যে ভূতের ভয় বা অমূলক কোনো ভয় আর কাজ করছে না। গুরুজীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়াও পড়ালেখায় আমার মনোযোগ ছিল না। সময়ের কাজ সময়ে করতাম না। পড়া জমিয়ে রেখে পরীক্ষার আগে সব পড়া একসাথে করতে হতো। এতে আমার টেনশন বাড়ত এবং পড়াগুলো ভালোভাবে হতো না।

এখানে এসে জেনেছি, সময়কে অবহেলা করলে সময়ও আমাকে অবহেলা করবে। কোর্সে এসে আমি সময়-সচেতন হতে পেরেছি।

[শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল। ৪১৮ ব্যাচ, ঢাকা]

সুখী পরিবার নির্মাণের শিক্ষা দেয় কোয়ান্টাম

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ

জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার জন্যে যতদিকে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, গুরুজী এ চারদিনের আলোচনায় আমাদেরকে সে শিক্ষা দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধির দায়িত্বে থাকার কারণে প্রতিদিনই আমাদেরকে অনেক মানুষের সমস্যার কথা, অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে হয়। সেই ভিত্তিতে তাদেরকে পরামর্শ দিতে হয়। আমি বিশ্বাস করি, কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করলে মানুষকে পরামর্শ দেয়া এবং তাদেরকে সহযোগিতা করা আমার জন্যে আরো সহজ হবে।

বর্তমান সময়ে দেশে বিবাহবিচ্ছেদ অনেকাংশে বেড়ে গেছে। নিয়ম অনুসারে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশের একটা কপি পৌরসভায় পাঠাতে হয়। মেয়রের কাজ হচ্ছে দুই পক্ষকে ডেকে তাদের মধ্যে সমঝোতা করার চেষ্টা করা। এসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত শুনতে হয় একে অপরের প্রতি অবিশ্বাসের কথা, নির্ঘাতনের কথা। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করে আমার ভেতরে একটা প্রত্যাশা কাজ করেছে যে, আমরা বিবাহবিচ্ছেদ কমাতে পারব। এ ধরনের সমস্যায় আমরা তাদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ করব কোয়ান্টামের এ প্রশিক্ষণে অংশ নিতে। এখানে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করতে যে ইতিবাচক শিক্ষাগুলো দেয়া হয়, তা অনুসরণ করলে পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর হবে এবং সুখী পরিবার গড়ে উঠবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

[মেয়র, পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম। ৪১৯ ব্যাচ]



আট বছরের হাঁচির সমস্যা থেকে এখন আমি মুক্ত

রহিমা বেগম



আট বছর ধরে হাঁচির সমস্যা ছিল, একবারে ২০-২৫ বার হাঁচি আসত। কখনো কখনো নাক দিয়ে রক্ত পড়ত। এছাড়া হাঁচিতে আর কোমরে খুব ব্যথা ছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, এলার্জির ওষুধ খেয়েছি কিন্তু

সুস্থ হতে পারি নি। যতক্ষণ ওষুধ খাই, ততক্ষণ ভালো থাকি, তারপর আবার অসুস্থ হয়ে যাই।

এরপর আমার ছোটবোনের উদ্যোগে আমি সাদাকায়নে যেতে শুরু করি। সেখানে কোয়ান্টাম বুলেটিন আর বইগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। আমার মধ্যে একটা বিশ্বাস কাজ করতে শুরু করল যে, মেডিটেশন করলে আমি সুস্থ হয়ে যাব।

এরপর আমি প্রতিদিন মেডিটেশন শুরু করলাম, একবার ফজরের নামাজের পর এবং আরেকবার এশার নামাজের পর। ধীরে ধীরে আমার হাঁচির সমস্যা দূর হতে লাগল, সাথে কোমর আর হাঁটুর ব্যথাও কমে যেতে লাগল। গত দুই মাস ধরে হাঁচির সমস্যাটা আর নেই।

আমি আগে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তাম। এখন আল্লাহর রহমতে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ি। কোর্সে এসে আমার সুস্থতার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে।

[সহকারী শিক্ষক, পটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। ৪১৯ ব্যাচ]

মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা কোয়ান্টাম মেথড

জয়ন্ত কুমার রায়

কোর্সে আসার আগে ভাবছিলাম, চার দিন একটানা বসে থাকব কীভাবে? কিন্তু কোর্স শেষে মনে হচ্ছে, এত আনন্দের মধ্য দিয়ে সময় কীভাবে কেটে গেল, বুঝতেই পারলাম না।

শ্রী রী র ক -

মানসিকভাবে আমি একজন সুস্থ মানুষ। তারপরও ইতিবাচক শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়ার জন্যে এবং জীবন সম্পর্কে আরো জানার জন্যে আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি। কোর্সে ইতিবাচকতার যে শিক্ষা আমি পেয়েছি, তা অকল্পনীয়।

গুরুজীর প্রতিটি কথা যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মসম্মত। কোর্স করে নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে। এখানে বার বার বলা হয়েছে, মানুষ হয়ে ওঠার সাধনার কথা। প্রতিটি জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যকে বুঝতে সাহায্য করে মেডিটেশন।

[কমার্শিয়াল এন্ড লজিস্টিক ম্যানেজার, সিঙ্গার বাংলাদেশ লি. ৪১৯ ব্যাচ, ঢাকা]

কোয়ান্টাম সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

অধ্যাপক সরোজ বড়ুয়া



আমি কোর্সে এসেছি আমার স্ত্রীর প্রেরণায়। মেডিটেশন সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল যে, এটি আধ্যাত্মিক অর্জনের একটি পথ। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, পার্থিব জগতের হেন কোনো বিষয় নেই যা

মেডিটেশনের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ মেডিটেশন হলো বিজ্ঞান। আর মেডিটেশন চর্চার ফলে আমরা জীবনকে উপলব্ধি করতে শিখছি।

এখানে সর্বধর্মের অংশগ্রহণকারী আছেন এবং এ বিষয়টি আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে। এটাই বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র। কোর্সে বার বার প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। সাধারণত যারা বিজ্ঞান অনুসারী, তারা ধর্মকে বিজ্ঞানের বাইরে রাখতে চান। অথচ ধর্ম আর বিজ্ঞানের সুন্দর সমন্বয় হলো এই কোর্স। এছাড়া বান্দরবান লামায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে গড়ে তুলতে যে উদ্যোগ কোয়ান্টাম নিয়েছে, তা এককথায় অসাধারণ।

[সাবেক শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ, হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম। ৪১৯ ব্যাচ]

অনিদ্রা ও মাইগ্রেন থেকে মুক্তি পেলাম

নুসরাত জাহান মমি



দেড় বছর আগে আমি একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। আমাদের বাসার তিন তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে প্রায় সাত মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। উঠে বসার মতো শক্তিও ছিল না।

সাত মাস পর আমি যখন আবার

নতুন করে হাঁটতে শুরু করলাম তখন প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হতো। ২০ মিনিটও আমি হাঁটতে পারতাম না, আমার পা ফুলে যেত, পায়ে পানি চলে আসত। কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা করত। কিন্তু এ কোর্সে এসে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পরও ব্যথা অনুভব করি নি।

এছাড়াও ছোটবেলা থেকে আমার মাইগ্রেন ছিল। আমি এসি রুমে ১০ মিনিটও বসতে পারতাম না, ধলাবালি সহ্য করতে পারতাম না। এ কোর্সে চার দিন এসিরুমে বসেছি কিন্তু আমার কোনো কষ্টই মাথাব্যথা হয় নি। ঘুমের সমস্যাও দূর হয়েছে। পরিবারের প্রতি আমার মমত্ববোধ অনেক বেড়েছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

[গৃহিণী। ৪১৯ ব্যাচ, চট্টগ্রাম]

মেডিটেশন আমার জীবনকে সুন্দর করেছে

জারু রায়

আমার কোমরে ও মাথায় বেশ ব্যথা ছিল। এক বছর পরামর্শে প্রতি শুক্রবার সাদাকায়নে যাওয়া শুরু করলাম। ৪০ দিন শিথিলায়ন মেডিটেশন করার পর দেখলাম, আমার শারীরিক সমস্যাগুলো দূর হয়ে গেছে। তারপর মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করা শুরু করি। এতে আমার ব্যবসায় আগের চেয়ে লাভ বেড়েছে।

আর চার দিনের কোর্সে এসে আমার উপলব্ধি হলো, সৃষ্টা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শক্তি দিয়েছেন। মেডিটেশন আমাদেরকে সেই শক্তিটা খুঁজে পেতে সাহায্য করে, যা কাজে লাগিয়ে একজন মানুষ তার জীবনকে ফুলের মতো সুন্দর করে তুলতে পারে। আমি সেই শক্তিটিই এখানে এসে আবিষ্কার করলাম।

[ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হবিগঞ্জ। ৪১৮ ব্যাচ, ঢাকা]



প্রশ্ন



উত্তর

প্রশ্ন : মনের বিষ তৈরি হয় এমন পরিস্থিতি থেকে যদি কেউ পরিত্রাণ না পায়, তবে সে কীভাবে তা দূর করবে? যদি তার মা/ বাবা/ ভাই/ বোন/ স্ত্রী/ স্বামী কেউ একজন খুব নেতিবাচক, কলহপ্রিয় ও জটিল মনের মানুষ হন এবং সে মানুষটির দায়িত্ব ও যত্নও তাকেই নিতে হয়, তখন তার মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরক্তি ক্ষোভ অভিমান ও অশান্তি তৈরি হয় এবং এটা ক্রমাগত তাকে হতাশা ও পরিশ্রান্ত করে তোলে। এই মনের বিষ থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায়?

উত্তর : বহু বছর আগের কথা। এক তরুণ তার বন্ধুর বাড়িতে গেছে বন্ধুকে ডাকার জন্যে। বন্ধুর বড় বোন মনে করতেন যে, সে একটা বাউন্ডুলে। দরজা নক করার পর দরজা খুলে এই তরুণকে দেখেই তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘ও বাসায় নেই’। তারপর সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। দিনের পর দিন এ ঘটনা ঘটতে লাগল। এই তরুণ এটা একটা মজার খেলা হিসেবে নিল। সে প্রতিদিন গিয়ে নক করত, বন্ধুর বোনও ‘নেই’ বলে দরজা বন্ধ করে দিতেন।

এদিকে তরুণটি কোনো ধরনের ঝগড়া বা বেয়াদবি ছাড়া মনে মনে বলেছে, ডেকে দেবেন না কেন? একদিন না একদিন দিতেই হবে। প্রায় মাস দুয়েক পর বোনের বিরক্তি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ঠেকল তখন তিনি একদিন ছোট ভাইকে ডেকে দিয়ে বললেন, ‘এই বেহায়া আজও এসেছে। প্রতিদিন দরজা বন্ধ করে দেই, তারপরও আসে!’

অতএব আপনিও এসব অপমান না নিলেই হলো। আপনাকেও যখন বকাবকি করে, উপভোগ করুন। ভাবুন যে, আহা! বেচারি কত দুঃখী! তাকে দেখার জন্যে আমি ছাড়া কেউ নেই। ভেবে দেখুন, কত করুণ তার অবস্থা! সে-তো মানসিকভাবে সুস্থ নয় বলেই গালিগালাজ করছে। এমন একজন মানুষের ওপরে রাগ করার কী আছে!

আর যদি মা-বাবা হয় বা শ্বশুর-শাশুড়ি হয়, তাহলে বলুন, আরো বকুন। আপনি আমাকে বকবেন না তো কাকে বকবেন? যদি কোনোদিন কম বকে, আপনি উৎসাহ দেবেন যে, আম্মা/ আক্কো আজকে তো বকাবকি করলেন না। কারণ একজন যখন বকে তখন সে এর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে অপেক্ষাও করে। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন দেখবে যে, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, তার বকা এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে।

আর নেতিবাচক মানুষ থেকে সবসময় দূরে থাকবেন। আপনি বলবেন, পরিবারের খুব কাছের মানুষ কেউ যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে দূরে থাকব কীভাবে? এই দূরে থাকা মানে হচ্ছে, তার কোনো কথা গ্রহণ করবেন না। সে যা-কিছু বলে বলুক, কখনো প্রভাবিত হবেন না। আপনি হাসবেনও না, কাঁদবেনও না। মজার খেলা হিসেবে নিন। উত্তেজিত হবেন না। আপনি রেগে গেলেন বা দুঃখ পেলেন মানে সে জিতে গেল।

কারণ সে-তো চাচ্ছে যে, আপনি আহত হন। আর আপনি যদি আহত না হয়ে পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়ান, যেন এগুলো কিছুই আপনার গায়ে লাগে না। তখন এমনিতেই সব বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ মানুষ যখন তার কথার কোনো রি-একশন পায় না, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

প্রশ্ন : পরিচিত যারা হার্টের অসুখে ভুগছেন, তাদেরকে মেডিটেশনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু হার্টে রিং পরানো বা প্রচলিত চিকিৎসাকেই তারা বেছে নিতে চায়। আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : আসলে যারা বুদ্ধিমান, তারা ইতোমধ্যে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্য হচ্ছেন। হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিচ্ছেন। তাদের অধিকাংশই স্টেন্টিং বা অপারেশন ছাড়াই সুস্থ জীবনযাপন করছেন। আর হার্টের স্টেন্টিং অর্থাৎ রিং পরানো বা হৃদরোগের প্রচলিত কোনো চিকিৎসাই কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারছে না। একথা এখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাই বলছেন।

তাছাড়া সহজ সমাধান থাকতে এত ব্যয়বহুল চিকিৎসায় কেন যাবেন? একেকটা রিংয়ের দাম কত? এর মধ্যে একটি রিপোর্ট এসেছে টাইমস অব ইন্ডিয়াতে (১৭ জানুয়ারি ২০১৭)। এই রিং-কে বলা হয় ড্রাগ ইল্যুটিং স্টেন্ট বা ডিইএস। ভারতে এর খরচ হচ্ছে স্থানীয়ভাবে তৈরি হলে আট হাজার রুপি এবং আমদানিকৃত হলে পাঁচ হাজার ইন্ডিয়ান রুপি। কিন্তু এই স্টেন্ট বা রিং ভোক্তা পর্যন্ত আসতে আসতে এর মূল্য দাঁড়ায় ৫০ হাজার রুপি থেকে এক লক্ষ ৬৫ হাজার রুপি। অর্থাৎ এর মূল্য বাড়ছে ২৭০ থেকে এক হাজার পার্সেন্ট পর্যন্ত।

রিপোর্টে বলা হচ্ছে, প্রত্যেকটা স্টেন্ট-এর ক্ষেত্রে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পাচ্ছেন ১৫ হাজার থেকে ৩৫ হাজার রুপি পর্যন্ত। যদি বিশেষজ্ঞরা তাদের লভ্যাংশ না পান, তারা সেই স্টেন্ট ব্যবহারে অসম্মতি জানান। ফলে একসময় মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে স্টেন্টটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়।

অতএব বুঝতেই পারছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শুধু বিক্রির ক্ষেত্রে কত লাভ করছে! এদিকে আপনি মনে করছেন—কত মূল্যবান স্টেন্ট!

সবচেয়ে বড় কথা হলো, চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাই এখন বলছেন যে, হৃদরোগীরা যে চিকিৎসাই নিচ্ছেন, কিছুদিন পরে ঘুরে-ফিরে আবার সেই একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

তাই সুস্থ থাকতে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করুন। বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করুন এবং নিয়মিত ব্যায়াম করুন। আত্মীয়স্বজন বন্ধু পরিচিতদের মধ্যে যারা হৃদরোগে ভুগছেন, তাদের কাছে এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ বইটি পৌঁছে দেবেন, এই আমি আর হৃদয় আমার ডকুমেন্টারি-টি দেখাবেন। যাতে স্টেন্ট লাগানোর মতো অবস্থায় আপনার আত্মীয়স্বজনকে পড়তে না হয়। কারণ একবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে তো সবাই বলবে, টাকা হাসপাতালওয়ালারা খায় খাক, কিন্তু আমার বাবা-মা বাঁচুক, আমার আত্মীয় বাঁচুক।

অতএব সুস্থ থাকার দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে। কারো যেন বিছানায় পড়ে থেকে মৃত্যু না হয়। সবচেয়ে সৌভাগ্যের মৃত্যু হচ্ছে ক্লিনিকে না গিয়ে সুস্থ অবস্থায় কাজ করতে করতে মৃত্যু।

আর সবসময় প্রার্থনা করবেন যে, আল্লাহ! আমি আমার দিক থেকে যা যা করার করছি, তুমি আমাকে সুস্থ রেখো। অর্থাৎ করণীয় সবকিছু করার পরে দোয়া করবেন। তখন এটা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।

প্রশ্ন : আমি বেশ ভালো অঙ্কের বেতন পাই। মাসের শুরুতেই আমার আয়ের এক তৃতীয়াংশ আমি একসাথে কোয়ান্টামের বিভিন্ন ফান্ড ও মাটির ব্যাংকে দান করি। টাকাটা সরাসরি শাখা/সেলের মাটির ব্যাংকের খাতে জমা দেই। প্রতিদিন নাশতার আগে ১০-২০ টাকা মাটির ব্যাংকে রাখি। আমার এই প্রক্রিয়া ঠিক আছে কিনা জানতে চাই। নাকি প্রতিদিন গড়ে যে পরিমাণ জমা দেয়া উচিত, আমি সেভাবে মাটির ব্যাংকে জমা দেবো?

উত্তর : আপনি যে আপনার আয়ের এক তৃতীয়াংশ দান করেন, এটা খুব ভালো। আপনি সঠিক প্রক্রিয়ায় দান করছেন। তবে সবচেয়ে ভালো হবে—আপনি প্রতিমাসে যে পরিমাণ দান করবেন, এটাকে যদি ভাগ করে প্রতিদিন সকালবেলা মাটির ব্যাংকে রাখুন। কারণ আপনার প্রতিদিনের দানের পরিমাণ কম, যদিও মোট পরিমাণ অনেক বেশি। আর প্রতিদিন ভালো পরিমাণ দান করলে এর বরকত, এর লাভ, এর দোয়া আরো বাড়তে থাকবে।

বোখারী শরীফের হাদীস হচ্ছে, ‘আল্লাহ প্রতিদিন দুজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, ‘আজ যারা দান করেছে তাদের কল্যাণে দোয়া করার জন্যে।’ আর আপনি যদি একদিনে অনেক দান করেন, তাহলে শুধু সেই দিন বেশি দোয়া হলো। তাই প্রতিদিন সাধ্যমতো দান করাটা বেশি ভালো।

যেমন, ব্যায়ামের নিয়ম হচ্ছে প্রতিদিন ব্যায়াম করা। প্রত্যেক মাসে একদিন-দুদিন বেশি ব্যায়াম করলে কোনো লাভ হয় না। আপনার শরীর সেটা নিতেও পারবে না। একইভাবে দানসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যত আপনি নিয়ম এবং শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে কাজগুলো করবেন, তত বেশি সফল পাবেন। কারণ রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, সেই আমলটাই হচ্ছে সর্বোত্তম, যা নিয়মিত করা হয়।

আর যারা মা-বাবা, তারা সন্তানকে দিয়ে দান করাবেন। তাহলে সন্তান দাতা হতে উদ্বুদ্ধ হবে। আর প্রত্যেকদিন এই দোয়া করে দান করবেন যে, আল্লাহ! এর চেয়ে বেশি যেন দিতে পারি, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও। তখন এই দান আপনার জন্যে আশীর্বাদ হয়ে যাচ্ছে।

অতএব, আপনার আয়ের এক তৃতীয়াংশ যে পরিমাণ হয়, তা ভাগ করে প্রতিদিন দেবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

স্বার্থপর কাজ মানুষকে ক্লান্ত করে। আত্মাকে কলুষিত করে। অন্যের জন্যে আন্তরিক সেবা ও দান ক্লান্তি দূর করে আত্মাকে আলোকোজ্জ্বল করে। আমি সুযোগ পেলেই ‘করসেবা’য় (অন্যের কল্যাণে সজ্ঞাবদ্ধ কাজ) অংশ নেব।

সাদাকায়ন ॥ সুখী পরিবার ও নৈতিক সমাজের সূতিকাগার

সবার জন্যে উন্মুক্ত এক ঘটাব্যাপী সাপ্তাহিক এই আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রমটি প্রতি শুক্রবার একযোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশজুড়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সকল সেন্টার, শাখা, সেল, প্রি-সেলে। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি শিক্ষার্থী পেশাজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আহ্বাই মানুষের অংশগ্রহণে সাদাকায়ন দিন দিন হয়ে উঠছে আরো প্রাণবন্ত। এতে থাকে বিষয়ভিত্তিক জীবনঘনিষ্ঠ আলোচনা, যৌথ মেডিটেশন, পরিবারের ও দেশের কল্যাণের জন্যে দোয়া ও শুভকামনার পাশাপাশি থাকে কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণের সুযোগ। নানা ধরনের কর্মপরিকল্পনা ও সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এ বছরের শুরু থেকেই সাদাকায়ন পেয়েছে নতুন গতি।



প্রতিবেশী, আত্মীয়-বন্ধু ও পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করণ

শুক্রবার সাদাকায়ন কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ নেয়ার ফলে লাখে মানুষের জীবনে এসেছে ইতিবাচকতার প্রাবল্য। তারা প্রতিবেশীর সাথে বলতে পারছেন, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ। বেশ ভালো আছি।' এই ইতিবাচকতাকে স্থায়ী করতে সাদাকায়নে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করণ আপনার চারপাশের প্রতিবেশী, আত্মীয়-বন্ধু ও পরিচিতদের।

সাদাকায়নে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ে বাড়বে একে অপরের প্রতি সমমর্মিতা। সঠিক জীবনদৃষ্টির সন্ধান পেয়ে অবিদ্যামুক্ত হবে মানুষ। তাই সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সবাইকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করণ। আপনি লাভ করবেন মানসিক তৃপ্তি, বাড়বে আপনার সংযোগায়ন দক্ষতা আর মানবিক মহাসমাজ গড়ার পথে তা হবে অগ্রগামী এক পদক্ষেপ।

মাসের প্রথম শুক্রবার পারিবারিক সাদাকায়ন

প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় পারিবারিক সাদাকায়ন। যৌথ পারিবারিক মেডিটেশনের পাশাপাশি সুখী পরিবার গড়ার সহজ কৌশলগুলো তুলে ধরা হয় আলোচনায়। সমমর্মিতা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা পরিবার থেকে শুরু হলে সমানভাবে উপকৃত হয় সমাজ ও রাষ্ট্র।

তাই পরিবারের ছোট-বড় সব সদস্যকে নিয়ে ফাউন্ডেশনের সদস্যরা সাদাকায়নে অংশ নিচ্ছেন। এতে তাদের পরিবারগুলোও পরিণত হচ্ছে আগের চেয়ে শান্তি সুখের আবাসস্থলে।

সাথে আনুন সন্তানকেও

তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ জোয়ার আর নানামুখী ব্যস্ততায় মা-বাবার সাথে সন্তানদের সম্পর্ক আজ অনেকটাই শিথিল। সময়ের সাথে সাথে এ দূরত্ব যেন আরো বাড়ছে। এই দূরত্ব কমাতে আপনার সন্তানকে নিয়ে অংশ নিন সাদাকায়নে।

এ ইতিবাচক পরিমণ্ডলে নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে বেড়ে উঠবে জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত হয়ে। ইন্টারনেট, ভিডিও গেম আর অপ্রয়োজনীয় আড্ডার পরিবর্তে তাকে সৃষ্টির সেবার জন্যে কিছু সময় ব্যয় করতে উৎসাহিত করণ। এতে বিকশিত হবে তার নেতৃত্বের গুণাবলিও।



সৃষ্টির সেবামূলক কাজে অংশ নিন

যৌথ মেডিটেশন ও জীবনঘনিষ্ঠ আলোচনা শোনার পাশাপাশি সাদাকায়ন হলো দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার এক অনন্য সুযোগ। ফাউন্ডেশনের প্রতিটি সেন্টার শাখা সেলে রয়েছে পাঁচটি টিম : ১. সাদাকায়ন টিম ২. মাটির ব্যাংক টিম ৩. কোর্স মোটিভেশন টিম ৪. রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণ টিম ও ৫. মর্মবাহী বিতরণ টিম।

এছাড়াও রয়েছে নানাবিধ আত্ম উন্নয়নমূলক ও সৃষ্টির সেবামূলক কার্যক্রম। স্বেচ্ছাসেবী এসব কাজে অংশ নিয়ে সদস্যরা অন্যের কল্যাণ যেমন করতে পারছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে নিজেরাও প্রশান্তি ও প্রাচুর্যের অধিকারী হচ্ছেন। আপনিও অংশ নিতে পারেন যে-কোনো সেবামূলক কাজে।

ভালো থাকুন সবার সাথে

জাতি হিসেবে আমরা সবসময়ই বন্ধুবৎসল ও সমাজকেন্দ্রিক। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মমতাপূর্ণ এ পরিবারগুলোকে আত্মকেন্দ্রিকতার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই। বাড়তে হবে পারস্পরিক সমমর্মিতার চর্চা। আর এই শুভচর্চার শুরুটাই হোক প্রতি শুক্রবার সাদাকায়নে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে।

ইতোমধ্যেই মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যৌথ মেডিটেশনের গুরুত্ব, ফলে বাড়ছে সাদাকায়নের ব্যাপ্তি ও পরিসর। বেশ কিছু শাখা-সেল-এ সাদাকায়ন হচ্ছে একাধিক সেশনে। আমাদের সংস্কৃতির নতুন এক অনুঘর্ষে পরিণত হচ্ছে সাদাকায়ন। তাই আপনিও আসুন। একা নয়, ভালো থাকুন সবার সাথে।



চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ী শাখায় নতুন সংযোজন শিশু সাদাকায়ন। শুরু থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এ কার্যক্রমটি।

কোয়ান্টাম প্রকাশনায় যুক্ত হলো

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদে
'ভাঙো দুর্দশার চক্র'

এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদেবর অনবদ্য গ্রন্থ **ভাঙো দুর্দশার চক্র**। ২২ ফেব্রুয়ারি কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় এর প্রকাশনা উৎসব। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদসহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী।

ফাউন্ডেশনের দুই সহস্রাধিক সদস্যের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারী।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন,

ফাউন্ডেশন গত এক যুগ ধরে আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যের ধারায় একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, যা ইতোমধ্যে দেশের লক্ষ পরিবারে পৌঁছে গেছে এবং অগণিত মানুষের মধ্যে জীবন-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে অবদান রেখে চলেছে। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের এ বইটিও লক্ষ মানুষের জীবনকে আশাবাদ ও ইতিবাচকতায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি আরো বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে সমবেত কোয়ান্টাম পরিবারের দু-সহস্রাধিক সদস্যকে নিয়ে আমরা এ দোয়াই করি-স্রষ্টা যেন আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় এ দুজন মানুষকে সুস্থ ও কর্মময় দীর্ঘজীবন দান করেন।



এরপর সম্মানিত অতিথিদ্বয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। তিনি বলেন, আমরা খুব সাধারণ কর্মী। আমরা দেশকে ভালবাসি এবং সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সাধ্যমতো কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি। আমাদের দেশে যাদের আমরা দেশপ্রেমিক ও সং মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করি, তেমন দুজন মানুষকে আজ আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি-যাদের উপস্থিতি, অনুপ্রেরণা, উদ্দীপনা, সাহস আমাদেরকে সবসময় সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সমস্ত প্রতিকূলতায়

উৎসাহ যুগিয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, **ভাঙো দুর্দশার চক্র** বইটি আমাদের সাহিত্যের একটি কালজয়ী ও চিন্তার রাজ্যে বাকবদলকারী প্রকাশনা হিসেবে দেশের তরুণ সমাজের হাতে হাতে পৌঁছে যাবে।

উল্লেখ্য, আত্মশক্তির জাগরণ ও ইতিবাচকতা বিকাশে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন **ভাঙো দুর্দশার চক্র**। বইমেলায় প্রকাশের দিন থেকেই পাঠক মহলে এটি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে, হাজারেরও বেশি পাঠক মেলা থেকে বইটি সংগ্রহ করেছেন।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

জীবনকে মহিমাম্বিত করতে হবে
কাজের মধ্য দিয়ে

অনেক মানুষ আছেন যারা নিজের দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্যে বিদেশে চলে যান, কিন্তু আমার ধারণা-কোনো মানুষের মধ্যে যদি আলো শক্তি প্রতিভা থাকে তিনি সাধারণত দেশ ত্যাগ করেন না। কারণ প্রতিটি মানুষের আত্মার আনন্দ আর জীবনের আসল পরিচয় তার মাতৃভূমিতে। বিদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে বেঁচে থেকে বড় কাজ করা খুবই কঠিন।

আর এক শ্রেণির মানুষ আছেন, বিদেশে বড় সাফল্য অর্জনের সুযোগ তাদের ছিল। কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যান

করে এই গরিব দেশটাকে তারা ভালবেসেছেন, এই জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী সেই দলের মানুষ। এজন্যে আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ একদিন অনেক বড় হবে। অনেক বড় বড় মানুষেরা এ জাতির মধ্যে জন্ম নেবে। বাংলাদেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হবে। এটা আমি নিজে গভীরভাবে বিশ্বাস করি। কারণ এ জাতির মধ্যে অসম্ভব মেধা আছে। এ অধ্যাত্রা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ আরো এগোবে।

আমরা কেউই চিরকাল থাকব না পৃথিবীতে। কিন্তু যে কদিন বেঁচে আছি, আমাদের দায়িত্ব হলো জীবনকে সর্বোচ্চ মহিমা দান করা। আর সেটা সম্ভব কাজের মাধ্যমে। এ কাজের মধ্য দিয়ে আমরা অশান্তি থেকে বাঁচব। দুঃখ থেকে বাঁচব। হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে বাঁচব। এবং একটা আনন্দময় জীবন শেষ করে আমরা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারব।

[প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য]

অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

এটা সত্যিই একটা অন্যরকম বই
যা ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অত্যন্ত আশাবাদী একজন মানুষ। তার লেখাতেও রয়েছে এর প্রতিফলন। **ভাঙো দুর্দশার চক্র** বইটিতে তার যে কথাগুলো সংকলিত হয়েছে, তাতে 'ইতিবাচকতা' আর 'আশাবাদ' শব্দ দুটো বার বার এসেছে। এটা সত্যিই একটা অন্যরকম বই। বইটা পড়তে গিয়ে উপলব্ধি করেছে, এর প্রতিটা বাক্যের মধ্যে একটা গভীর অর্থ আছে, যা আমাদের ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

আমার মেন্টর ও বিশ্বখ্যাত স্থপতি ড. এফ আর খান বলতেন-‘এ টেকনিক্যাল ম্যান মাস্ট নট বি লস্ট ইন হিজ ওন টেকনোলজি; হি মাস্ট বি অ্যাবল টু এপ্রিশিয়েট লাইফ, এন্ড লাইফ ইজ আর্ট, ড্রামা, মিউজিক এন্ড মোস্ট ইম্পোর্টেন্টলি পিপল।’ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদও তার বহুমুখী কাজের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মের মাঝে এমন ধারণা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন।

বহু অনুষ্ঠানে আমি যাই, কিন্তু এমন মনোযোগী শ্রোতা আর কখনো পাই নি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আমি প্রথম এসেছিলাম বছর দশেক আগে।



পরবর্তীকালে কোয়ান্টাম আইসিটি প্রোগ্রাম উদ্বোধন করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল।

কোয়ান্টামের উদ্যোগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্লাড ক্যাম্পও অনুষ্ঠিত হয়। এসবের পাশাপাশি কোয়ান্টামের যে একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা কার্যক্রম আছে, সেটা জেনেও ভালো লাগল। আশা করি, ভবিষ্যতে এখান থেকে এ ধরনের আরো ভালো ভালো বই প্রকাশিত হবে।

[প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য]